স্ত্রীর চোখে লেখক জগদীশ গুপ্ত

প্রসঙ্গ-কথা

জগদীশ গুপ্তর (১৮৮৬-১৯৫৭ খ্রী.) স্ত্রী শ্রীমতী চারুবালা গুপ্তর (জন্ম ১৩০১ বঙ্গাব্দ) সঙ্গে শ্রীশংকরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গৃহীত সাক্ষাৎকারটি নানা কারণে মূল্যবান। জগদীশ গুপ্ত তাঁর জীবনকালে লেখক হিসেবে উপযুক্ত স্বীকৃতি পান নি বলেই বোধ হয় কেউ তাঁর জীবনী বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। এখন তাঁর বিষয়ে নতুন করে উৎসাহ দেখা দিয়েছে, কিন্তু তাঁর বিষয়ে তথ্য শুধু কম নয়, পাবার উপায়ও প্রায় বন্ধ। তাঁকে যাঁরা অন্তরঙ্গভাবে জানতেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই আজ আর বেঁচে নেই। শ্রীমতী চারুবালা গুপ্ত এতদিন পর্যন্ত তাঁর স্বামীর বিষয়ে যে-সব তথ্য স্মৃতিতে ধরে রেখেছিলেন, শ্রীশংকরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সেগুলি প্রকাশিত হলো। এই সাক্ষাৎকারের সূত্রেই আমরা জানতে পারি যে, ড. রাধাবিনোদ পাল জগদীশ গুপ্তর সহপাঠী ছিলেন এবং আমরণ তাঁদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। তথ্যটি দুজনের ব্যক্তিত্বের একটি নতুন দিক উন্মোচিত করে। একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজ্ঞ, আরেকজন মফস্বল আদালতের টাইপিস্ট— এই দুজনের বন্ধুত্বের ভিত্তি কী ছিল? বাল্য-পরিচয় না সাহিত্যপ্রেম? তেমনি অনেকগুলি টুকরো টুকরো ঘটনার মধ্য দিয়ে জগদীশ গুপ্তর কিছু কিছু গল্পের উৎস সন্ধান করা যেতে পারে। যেমন আইজদ্দি পেয়াদা জাতীয় চরিত্র তাঁর একাধিক গল্পে আছে, বিশেষ করে নাম গল্পটি সহ *পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক* গ্রন্থে। জগদীশ গুপ্ত নিম্নশ্রেণির মহিলাদের কহল-বিবাদ খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন। মনে হয় 'রসাভাস' (*শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রীর* অন্তর্ভুক্ত) ধরনের গল্পগুলিতে তার প্রভাব পড়ে থাকবে। শ্রীযুক্তা চারুবালা গুপ্ত বলেছেন যে, জগদীশ গুপ্ত '১৪-১৫ বৎসর বয়সের সময় একবার গড়াই নদীতে ডুবে যাচ্ছিলেন'— এই স্মৃতি 'দিবসের শেষে' গল্পটির প্রেরণা কি না কে জানে! সাক্ষাৎকারের এক জায়গায় প্রশ্ন করা হয়েছে যে, স্বামীকে লিখতে দেখলেই তিনি 'এক পয়সার ধনে', 'এক পয়সার মৌরী' কিনতে তাঁকে পাঠাতেন কি না। এই প্রসঙ্গে কৌতূহলী পাঠক জগদীশ গুপ্ত-র প্রথম গ্রন্থ *বিনোদিনী*-র (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) অন্তর্ভূত 'গল্প কেন লিখিলাম' ভূমিকাটি দেখতে পারেন। *মহিষী* প্রসঙ্গে যে একশোটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের তালিকার কথা বলা হয়েছে তার সংকলক ছিলেন প্রিয়রঞ্জন সেন।

এই সাক্ষাৎকার বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়েছে শ্রীমতী চারুবালা গুপ্তর ব্যক্তিত্বের

গুণে— অতিকথন বা ঊনকথন কোনোটাই তিনি করেন না। তাঁর ভাষা স্পষ্ট, সহজ এবং বাহুল্যবর্জিত। আর আশ্চর্য হতে হয় তাঁর সাহিত্যবোধ দেখে। তিনি বলেছেন যে তাঁর পড়াশোনা পাঠশালা পর্যন্ত। তার পর বাড়িতেই যা লেখাপড়া করেছেন। কিন্তু তাঁর বিচারবুদ্ধি কী রকম তীক্ষ্ণ বোঝা যায়, যখন দেখি তিনি জগদীশ গুপ্তর *অসাধু সিদ্ধার্থ* পড়ে মন্তব্য করছেন 'এ তো প্রভাতবাবুর *রত্নদ্বীপের* মতো'। পরে কোনো সমালোচক এ-দুটি উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন। অত্যন্ত সহজভাবে এই প্রতি-তুলনা মনে আসায় বোঝা যায় যে পাঠক হিসেবে তিনি আদৌ আনাড়ি নন।

অনেক সময়ে লক্ষ্য করি যে লেখকদের চেয়ে তাঁদের স্ত্রীরা বেশি আত্মসচেতন। স্ত্রীরা বিখ্যাত হলে স্বামীদের বেলাতেও হয়তো একই রকম ঘটে। শ্রীমতী চারুবালা গুপ্ত অন্য ধরনের বলে তাঁর সাক্ষাৎকারে লেখক এবং মানুষ জগদীশ গুপ্তর একটি সামগ্রিক ছবি ফুটে ওঠে। আর এই স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করি আরেকজন ব্যক্তিকে— দৃষ্টিক্ষীণতা, দারিদ্র্য, নিঃসঙ্গতা কোনো কিছুই যাঁকে ম্লান করতে পারে না।

ভূমিকা

ঔপন্যাসিক জগদীশ গুপ্ত বিষয়ে পড়াশুনোর জন্য ওঁর ব্যক্তিজীবন সংক্রান্ত কিছু তথ্যের প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন টুকরো রচনা থেকে যেটুকু তথ্য পেলাম, আমার প্রয়োজনের পক্ষে তা পর্যাপ্ত নয়। তারই ফলে জগদীশ গুপ্তর সহধর্মিণী— চারুবালা গুপ্তর সঙ্গে সাক্ষাৎকারটির ব্যবস্থা করতে হলো।

চারুবালা গুপ্তর স্মৃতিভ্রংশতা সম্পর্কে একটি প্রচারের কথা জানা ছিল। তাই ভয় ছিল ওঁর সঙ্গে দেখা করা হয়তো পণ্ডশ্রম হবে। কিন্তু সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে দেখলাম ওঁর স্মৃতিভ্রংশতার বিষয়টি অলীক। অশীতিপর বার্ধক্যের ন্যুব্জতা এবং দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা ছাড়া তার আর কোনো অসুবিধে আমি দেখিনি। নিকট অতীত যদিও-বা উনি কিছু বিস্মৃত হন, কিন্তু দূর অতীত ওঁর কাছে আজও খুব স্পষ্ট। সাবলীলভাবে প্রতিটি ঘটনা উনি বলেছেন, প্রতিটি প্রশ্নের সরাসরি স্পষ্ট উত্তর উনি দিয়েছেন। আমি শুধু অনুলেখকের কাজ করেছি। ওঁর বলা শব্দ একটাও পাল্টাই নি।

চারুবালা গুপ্তর সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ করিয়ে দেন শ্রীসমরেন্দ্রনাথ লালা। তিনি তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করে দুদিন (১৭ এবং ২২ জুন, ১৯৮১) সর্বক্ষণ আমার সঙ্গী ছিলেন। এজন্য তাঁর কাছে আমি একান্ত কৃতজ্ঞ।

এ ছাড়া, যে দুজনের সাহায্য না পেলে আমি এ সাক্ষাৎকার নিতে পারতাম না তাঁরা হলেন দুটি তরুণ— একজন কুট্টি (বলরাম পাঠক) ও তাঁর ভ্রাতা দয়াল পাঠক। পাঠক পরিবার এবং কুট্টি, দয়ালের নিবিড় মনোযোগ ব্যতীত চারুবালা গুপ্তর বর্তমান নিঃসঙ্গ নিঃসহায় জীবন বোধ হয় দুর্বিষহ হয়ে উঠত! ব্যক্তিগতভাবে এবং জগদীশ গুপ্তর রচনার

প্রতি শ্রদ্ধাশীল একজন পাঠক হিসেবে, দয়াল, কুট্টি এবং পাঠক পরিবারকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

শংকরকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রশ্ন : শংকরকুমার চট্টোপাধ্যায় উত্তর : চারুবালা গুপ্তা

প্রশ্ন : আপনার বয়স কত হলো?

উত্তর : ৮৮ বৎসর। আমার জন্ম হয়েছিল বাংলা ১৩০১ সনে।

প্রশ্ন : কত সালে বিয়ে হয়েছিল?

উত্তর : ১৩১৩ সনে।

প্রশ্ন : জগদীশ গুপ্তের বয়স কত ছিল তখন?

উত্তর : ২০।২১ বৎসর।

প্রশ্ন : আপনার বিয়ের সময় জগদীশ গুপ্ত কি চাকরি করতেন?

উত্তর : না। তখন তিন ছাত্র ছিলেন।

প্রশ্ন : আপনার বাপের বাড়ির কথা কিছু বলুন।

উত্তর : আমাদের অবস্থা খুব ভালো ছিল। বড়ো জোতদার বলতে পার। আমার বাপের বাড়ি ওসমানপুর গ্রামে। ওসমানপুর ছিল নদীয়া জেলায়। তখন বাংলা ভাগ হয়নি। ওসমানপুর থেকে শিলাইদহ ছিল খুব কাছে। আমরা ছিলাম দুই ভাই এবং চার বোন। বোনদের মধ্যে আমি ছিলাম সেজ। আমার বিয়ের সময় আমার এক দাদা সেকেণ্ড ইয়ারে পড়তেন এবং বড়দা ডাক্তারি পড়তেন। পরে উনি কটকে ডাক্তার হন। অন্য দাদা অল্প বয়সে মারা যান। আমার বাবা যদুনাথ সেনগুপ্ত ওকালতি করতেন। তিনি ছিলেন রাজবাড়ির উকিল। আমার শ্বশুরমশাই কৈলাসচন্দ্র গুপ্ত— তিনিও ছিলেন কুষ্ঠিয়ার উকিল।

প্রশ্ন : আচ্ছা আপনার বিয়ের ব্যাপারে কোনো বিশেষ ঘটনা আপনার মনে আছে?

উত্তর : আমার ছোটোবেলায় আমাদের বাড়িতে এক সেরেস্তাদার ছিলেন। তিনি হাত দেখতে পারতেন। তিনি আমার হাত দেখে বলেছিলেন 'তোর খুব ভালো মানুষের সঙ্গে বিয়ে হবে।' তাই হয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনার শ্বশুরবাড়ির কথা কিছু বলুন।

উত্তর : আমার শ্বশুরমশাই-র আদি বাড়ি ছিল ফরিদপুর জেলার মেঘচুম্বীতে। লোকে বলত মেঘচামী। আমার শ্বশুরমশাই ছিলেন অবস্থাপন্ন মানুষ। একটা বিরাট বড়ো সংসার তাঁর আয়ে প্রতিপালিত হতো। অনেক আশ্রিত আত্মীয়-অনাত্মীয়কে আমার শ্বশুরবাড়ির সংসারে থাকতে দেখেছি। তখন খুব পর্দা প্রথা ছিল। শ্বশুরমশাই-এর সঙ্গে কখনো কথা বলিনি! আমরা মেয়েরা থাকতাম অন্দরমহলে।

প্রশ্ন : আপনাদের কুষ্ঠিয়ার বাড়ির কি হলো?

উত্তর : আমার শ্বশুরমশাই মারা যাবার পর, কুষ্ঠিয়ার বাড়ি ভোগ দখল করতেন আমার ভাসুর আর তাঁর পরিবাররা। দেশ ভাগের পর কুষ্ঠিয়ার বাড়ি আমার ভাসুর বিক্রি করে দেন।

প্রশ্ন : জগদীশ গুপ্তর ছোটোবেলার কথা কিছু জানেন?

উত্তর : উনি ১৪।১৫ বৎসর বয়সের সময় একবার গড়াই নদীতে ডুবে যাচ্ছিলেন। ওঁর সঙ্গে একসঙ্গে পড়ত সীতানাথ কর্মকার। সেই ওঁকে বাঁচায় ; একবার ফুটবল খেলতে গিয়ে পা ভেঙেছিলেন। আর একবার কুকুরে কামড়েছিল।

প্রশ্ন : জগদীশ গুপ্ত কলকাতায় যখন পড়াশুনো করতেন তখন কোথায় থাকতেন?

উত্তর : উনি থাকতেন হ্যারিসন রোডের একটা মেসে। মেসে ওঁর গার্জেন ছিলেন গিরিজা গুপ্ত। গিরিজা গুপ্ত ছিলেন ওঁর মার জ্যাঠতুতো ভাই। মামা হলেও গিরিজা গুপ্ত ওঁর থেকে বয়সে মাত্র চার বছরের বড়ো ছিলেন। গিরিজা গুপ্তর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল জুয়েলার শ্রীকৃষ্ণ দাসের মেয়ের। গিরিজা গুপ্ত বি.এ.ল' পাশ করলেও ওকালতি করেন নি। তিনি রংপুরে কাকিনা স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। এই মামা আমাদের খুব স্নেহ করতেন।

প্রশ্ন : জগদীশ গুপ্ত রিপন কলেজ থেকে পড়াশুনো ছেড়ে দেন ১৯০৬ সাল নাগাদ। এর কারণ কি অর্থনৈতিক?

উত্তর : একেবারেই না। এ রকম ধরনের একটা ধারণা আছে যে উনি টাকা-পয়সার অভাবে আর সংসার চালানোর জন্যেই পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভুল। কারণ উনি যখন পড়াশুনা ছাড়েন তখন আমার শ্বশুরমশাই জীবিত এবং রোজগার করছেন। পরে আমার ভাসুরঠাকুর জ্যোতিষচন্দ্র গুপ্তও ওকালতি শুরু করেন। তিনি মোহিনী মিলেরও উকিল ছিলেন।

আসলে উনি ছিলেন একটু খামখেয়ালি মানুষ। তার উপরে ওই সময়ে প্রায় চল্লিশ দিন টাইফয়েডে ভুগেচিলেন। বেশি দিন কলেজ কামাই করার জন্য সে বছর কলেজ থেকে ওঁকে পরীক্ষা দিতে সীট দিল না। উনিও রাগ করে আর পড়লেন না।

প্রশ্ন : পড়াশুনো ছেড়ে দেওয়ার জন্য জগদীশ গুপ্তের বাবা মনঃক্ষুণ্ণ হন নি?

উত্তর : হ্যাঁ। বাড়ির সকলেই খুবই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তবে আমার শ্বশুরমশাই ছিলেন খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ। তাঁর ইচ্ছে ছিল উনি (জগদীশ গুপ্ত) ওকালতি— নিদেনপক্ষে মোক্তারি পড়ুন। উনি ওঁকে (জগদীশ গুপ্তকে) শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন 'লেখাপড়া যে ছাড়লে খাবে কী করে?' উনি (জগদীশ গুপ্ত) জবাবে বলেছিলেন— 'টাইপ-শর্টহ্যাণ্ড শিখব।'

—টাইপ-শর্টহ্যাণ্ড শিখে কী হবে?

—ওতে চাকরি পাওয়া যাবে।

এরপর উনি টাইপ-শর্টহ্যাণ্ড শেখার জন্য কলকাতা চলে আসেন।

প্রশ্ন : ছাত্রজীবনে জগদীশ গুপ্ত কী ধরনের ছেলেদের সঙ্গে মিশতেন?

উত্তর : ভালো ছেলেদের সঙ্গেই মিশতেন। অন্তত ওঁর ছোটোবেলার একজন সহপাঠীর নাম করতে পারি যাঁর সঙ্গে ওঁর আমৃত্যু যোগাযোগ ছিল তিনি হলেন ডঃ রাধাবিনোদ পাল।

প্রশ্ন : জগদীশ গুপ্ত যখন চাকরি পান তখন ওঁর বয়স কত ছিল?

উত্তর : ২৩।২৪ বৎসর। আমার ১৫।১৬ বৎসর।

প্রশ্ন : উনি কি চাকরি করতেন?

উত্তর : উনি ছিলেন কোর্টের জব টাইপিস্ট।

প্রশ্ন : ওঁর চাকরি জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : উনি প্রথমে সিউড়ি জজকোর্টে চাকরি শুরু করেন জব টাইপিস্ট হিসাবে। চাকরিটার সন্ধান দেন জ্ঞাতি দাদা যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। আমি, শাশুড়ির (সৌদামিনী দেবী) সঙ্গে সিউড়ি যাই। সিউড়ির বাসায় কিছুকাল একসাথে কাটানোর পর উনি (সৌদামিনী দেবী) কুষ্ঠিয়ায় ফিরে যান। আমি সিউড়িতে থেকে যাই। ৫।৬ বৎসর সিউড়িতে চাকরি করার পর উনি (জগদীশ গুপ্ত) সিউড়ির চাকরি ছেড়ে দেন। সিউড়ি কোর্টের চাকরি ছেড়ে উনি উড়িষ্যার সম্বলপুরে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে টাইপিস্টের চাকরি নেন। এই সময় আমার বয়স ২৫।২৬ বৎস। ৬-৭ বৎসর সম্বলপুরে চাকরি করার পর উনি ঐ চাকরি ছেড়ে দেন। তারপর পাটনা হাইকোর্টে টাইপিস্টের চাকরি নেন। পাটনা হাইকোর্টে ৯।১০ বৎসর চাকরি করার পর ওপরওয়ালার সঙ্গে বনিবনা হলো না। উনি পাটনার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কুষ্ঠিয়া চলে আসেন নিজের বাড়িতে। এসে উনি ফাউন্টেন পেনের কালি তৈরির ব্যবসায় নামেন। এজন্য জার্মানি থেকে দোয়াতও আনিয়েছিলেন। এই কালির ব্যবসায় বিরাট লোকসান হয়। উনি মুখ ফুটে টাকা চাইতে পারতেন না। সেজন্য অনেকেই ঠকিয়েছিল। কালির ব্যবসায় ফেল পড়ল। বিরাট অর্থক্ষতি। পাটনা ছাড়ার পাঁচ বছর বাদে উনি আবার বোলপুর আদালতে চাকরি জোগাড় করলেন। ঐ টাইপিস্টেরই চাকরি। এখানে ১০ বৎসর চাকরি করার পর উনি রিটায়ার করেন। উনি রিটায়ার করার পর আমরা লেক মার্কেটে আমার আত্মীয় ক্ষিতীশ গুপ্তের বাড়িতে এসে প্রথমে উঠি। তার পর বর্তমান এই বাড়ি সি ৩৬ রামগড় কলোনিতেই আছি। এই বাড়িতে ১৯৫৭ সালে উনি পরলোকগমন করেন।

প্রশ্ন : চাকুরি জীবনে উনি কী রকম রোজগার করেছেন?

উত্তর : প্রথমে সেউড়িতে থাকতে তখনকার বাজারে ৯০।১০০ টাকার মতো রোজগার করতেন। পরে পাটনা থাকার সময় তো মাসে ৩০০।৪০০ টাকা পর্যন্ত রোজগার করেছেন। এ ছাড়া গল্প-কবিতা লিখে প্রায়ই ১০।১৫ টাকা পেতেন।

প্রশ্ন : আপনি তো খুব কম সময় থেকেই স্বাধীনভাবে সংসার করেছেন। জগদীশ গুপ্তর চাকরি জীবনে সংসার চালাতে গিয়ে আপনি কি কোনো অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন?

উত্তর : উনি যা রোজগার করেছেন তাতে আমাদের দুজনের ছোটো সংসারের খরচ কুলিয়ে গেছে। এছাড়া দু-একজন ঝি-চাকরও আমি রাখতে পেরেছি। অবশ্য তারা বাড়িতে খেত না।

প্রশ্ন : আচ্ছা আপনি তো একা একা সংসার করতেন, ভয় করত না?

উত্তর : ভয় কেন করবে? ঝি-চাকর ছিল, প্রতিবেশীরা ছিলেন, আর তা ছাড়া সব থেকে বড়ো ভরসা উনিই তো ছিলেন।

প্রশ্ন : জগদীশ গুপ্তর কোনো অসুখ-বিসুখ নিয়ে আপনাকে কখনো বিব্রত হতে হয়নি?

উত্তর : অসুখ-বিসুখের মধ্যে ওঁর প্রেসার ছিল। হাই ব্লাড-প্রেসার। নিজের শরীরের প্রতি নিজে কখনো যত্ন নিতেন না। মাঝে মাঝে অম্বলের ব্যথাতেও কষ্ট পেতেন। শুনেছি ছোটোবেলায় খুব নাকি ঘি খেতেন। কুষ্ঠিয়াতে ঘি-মাখন খুব পাওয়া যেত। খেতেও খুব সুস্বাদু ছিল, বেশি ঘি খাওয়ার জন্য ছোটবেলায় ওর লিভারটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পাটনা থাকতে ওঁর খুব মাথা ধরত। কুষ্ঠিয়ার দ্বিজ কবিরাজ একটা তেল দিয়েছিল মাথায় মাখতে। তেলটা কোন দোকান থেকে কিনবে তাও বলে দিয়েছিল। বেলফুলের মতো গন্ধ ছিল তেলটা। ওর মাথা ধরার রোগটা এই তেল মেখে ভালো হয়ে যায়। এ ছাড়া জ্বর হলে চুপচাপ শুয়ে থাকতেন একা একা। শেষ বয়সে চোখে ছানি পড়েছিল। চোখে দেখতে পেতেন না ভালো। একদিন এই অবস্থায় পড়ে যান। সেটাই হলো ওঁর শেষ শোয়া।

প্রশ্ন : আচ্ছা উনি মুরলীধর বসুকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন যে আপনি অসুস্থ তাই ওঁকে রান্না করে খেতে হচ্ছে। চিঠিটা লেখা হয়েছিল বোলপুর থেকে।

উত্তর : হ্যাঁ, আমার একবার ম্যালেরিয়া হয়েছিল খুব। সে সময় বাড়িতে ঠাকুরও ছিল না। ওঁকে রান্না করতে হয়েছিল। তবে ইকমিক কুকার ছিল।

প্রশ্ন : কারো হাতে রান্না খাওয়ার ব্যাপারে ওঁর কি কোনো বাছ-বিচার ছিল?

উত্তর : না, কোনো রকম সংস্কার ওঁর মধ্যে কখনো দেখি নি। এমন কি ঠাকুর দেবতা সম্পর্কেও ওঁর কোনো বাড়াবাড়ি কখনো দেখিনি। তেমনি অশ্রদ্ধা বা অভক্তিও দেখি নি।

প্রশ্ন : কোনো নেশা ছিল?

উত্তর : উনি খুব তামাক খেতেন গড়গড়ায়। সেইসঙ্গে বিড়ি সিগারেট। চাও খেতেন খুব। এছাড়া কোনো বদ নেশা অথবা অন্য কোনো চরিত্র দোষ তাঁর মধ্যে আমি কখনো দেখি নি।

প্রশ্ন : ওঁর শখ কী ছিল?

উত্তর : পোশাক-আশাকে কোনো শখ-সৌখিনতা কখনো ওঁর মধ্যে দেখিনি। বাড়িতে

তো খালি গায়ে লুঙ্গিই পরতেন। পাঞ্জাবি ছিঁড়ে গেলে পুরনো পাঞ্জাবি দর্জির কাছে পাঠিয়ে মাপ দিয়ে আমিই পাঞ্জাবি তৈরি করিয়ে দিতুম। বিয়ের আংটিটা পরতে পারতেন না। বলতেন অসুবিধে হয়। সেইজন্য সেই আংটি ভেঙে একটা আড়াই ভরির বোতাম করে দেওয়া হয়েছিল, পাটনা থাকতে চোরে সেটা চুরি করে নেয়।

প্রশ্ন : ওঁর খেলাধূলা বা অন্য কোনো বিষয়ে শখ ছিল?

উত্তর : যৌবনে প্রচুর ফুটবল খেলেছেন, ফুটবল খেলতে খুব ভালোবাসতেন। ছোটোবেলায় ফুটবল খেলতে গিয়ে তো একবার পা-ও ভেঙেছিলেন। এছাড়া ঘুড়ি ওড়ানোতে খুব উৎসাহ ছিল। বেশ বেশি বয়স পর্যন্ত ওঁকে ঘুড়ি ওড়াতে দেখেছি। এ ছাড়া সাঁতার কাটতে খুব ভালোবাসতেন। কুষ্ঠিয়ার গড়াই নদীতে সাঁতার কাটতেন। পাটনায় থাকতে রোজ গঙ্গায় সাঁতার কেটে চান করতেন। গান গাইতে যদিও পারতেন না কিন্তু খুব ভালো বাঁশি, হারমোনিয়াম, বেহালা এবং এস্রাজ বাজাতে পারতেন।

প্রশ্ন : জগদীশ গুপ্তর গান-বাজনার শখ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : ওঁর গান-বাজনার শখ বরাবর ছিল। কুষ্ঠিয়ায় নন্দ সরকারের বাড়িতে গান-বাজনার আসর বসত জানি। ওঁরা গান-বাজনা করতেন আর নন্দ সরকারের বিধবা খুড়িমা ওঁদের রেঁধে খাওয়াতেন। কুষ্ঠিয়ার বারোয়ারিতলায় প্রতিষ্ঠিত ছিল গোপীনাথ জিউ-এর বিগ্রহ। সেখানে হরিরলুঠ হতো, কীর্তন হতো। আমার শ্বশুরমশাই ঐ বারোয়ারিতলার সেক্রেটারি ছিলেন। আমরা কীর্তন শুনতে গিয়ে দেখি উনি বেহালা নিয়ে কীর্তনিয়ার পাশে বসে আছেন। বোলপুরে হরিসভায়ও বেহালা বাজাতে দেখেছি। এছাড়া বেহালাতে সব থেকে বেশি বাজাতেন রবীন্দ্রনাথের গান। ঠিক কি কি গান বাজাতেন আজ আর মনে নেই। তবে সম্বলপুরে থাকতে ছুটিতে ভাসুরপো বেড়াতে এসেছিল। তাকে একটা গান উনি শিখিয়েছিলেন। গানটা আমার আজও মনে আছে— 'তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে...'।

এস্রাজেও রবীন্দ্রসংগীত বাজাতেন। বাঁশি বাজাতেন খুব। বোলপুরে থাকতে বাঁশি বাজাতে গিয়ে তো একটা কাণ্ড হয়েছিল। বাড়ির সামনের মাঠে অফিসের বাবুদের সঙ্গে বসে অন্ধকারে সন্ধেবেলা বাঁশি বাজাচ্ছেন। হঠাৎ বাড়িতে এসে আমাকে বললেন 'একটু জল আনো তো, গা-টা ধুতে হবে।' আমি কারণ জিজ্ঞেস করতে বললেন 'গায়ে একটা সাপ উঠেছিল।' সেই ঘটনার পর থেকে অন্ধকারে বাঁশি বাজানো ছেড়ে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : আচ্ছা, উনি কি নজরুলের গান বাজাতেন?

উত্তর : না। নজরুলের সঙ্গে ওঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না।

প্রশ্ন : আর কোন কোন গান বাজাতেন উনি?

উত্তর : অনেক গান বাজাতেন। সব আমি বুঝতুমও না। আজ সব মনেও নেই।

প্রশ্ন : দেশ ভ্রমণের ঝোঁক ছিল?

উত্তর : দেশ ভ্রমণের ঝোঁক ছিল না। চাকুরির জন্য যেটুকু ঘুরেছেন। একবার কাশী যাবার কথা হয়েছিল। *উত্তরা*-র সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তীর বাড়িতে যাবার কথা ছিল। হয়ে ওঠে নি। তবে একবার উনি শোনপুরের মেলায় গিয়েছিলেন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে। আমি যাই নি। আমাকে নিয়ে বড় কোথাও একটা যেতেন না। বীরভূমে থাকতে আমি একা ঝি এর সাথে বক্রেশ্বর তারাপীঠ গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : আচ্ছা শিলাইদহ তো আপনাদের দেশের বাড়ির খুব কাছে ছিল। জগদীশ গুপ্ত কখনো শিলাইদহ গেছেন?

উত্তর : উনি শিলাইদহে কখনো যান নি। তবে আমার শ্বশুরমশাই-এর সঙ্গে শিলাইদহের নায়েব গোমস্তার যোগাযোগ ছিল মামলার ব্যাপারে। আগে শিলাইদহ কাছারির উকিল ছিলেন চন্দ সাণ্ডেল। পরে হন আমার শ্বশুরমশাই।

প্রশ্ন : বোলপুরে থাকতে জগদীশ গুপ্ত কখনো শান্তিনিকেতনে গেছেন?

উত্তর : হ্যাঁ। মুরলীধরবাবুর (মুরলীধর বসু) শ্বশুর-বাড়ি ছিল শান্তিনিকেতনে। তিনি শ্বশুরবাড়িতে এলে উনি শান্তিনিকেতনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন।

প্রশ্ন : শান্তিনিকেতনে গিয়ে উনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতেন?

উত্তর : হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথকে বই দিয়ে এসেছেন। তবে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে উনি মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে যেতেন। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী অমিয়া দেবীর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। ঝিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কখনো কখনো যেতাম, ওঁর সঙ্গে যেতাম না। শান্তিনিকেতনে উৎসবের সময় যেতাম, *কালের যাত্রা* নাটক দেখেছিলাম। যে নাটকে রবীন্দ্রনাথ নিজে অভিনয় করেছিলেন, দেখেছি।

প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওঁর চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল?

উত্তর : ছিল। *বিনোদিনী* বেরনোর পর রবীন্দ্রনাথ খুব প্রশংসা করেছিলেন সে কথা জানি। তিনি ওঁর লেখা সম্পর্কে বলেছিলেন 'তোমার লেখায় রূপ ও রস আছে'।

প্রশ্ন : আচ্ছা জগদীশ গুপ্ত তো তাঁর লেখা, অফিসের কাজ, বন্ধুবান্ধব নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আপনার সময় কাটত কী করে?

উত্তর : সময়ই পেতাম না। সারাদিন সংসার করে, রান্না করে, ওঁর দেখাশুনো করে যেটুকু সময় থাকত খুব সেলাই করতাম আর বই পড়তাম। বই পড়ার খুব নেশা ছিল। সেলাই-এরও নেশা ছিল।

প্রশ্ন : আপনি কতদূর পড়াশুনো করেছেন?

উত্তর : পাঠশালার পড়া শেষ হলে বাড়িতে কিছু পড়াশুনো করেছি, তারপর বিয়ে হয়ে গেল। পরে বই পড়ার ভেতর দিয়ে, চিঠিপত্র লেখার ভেতর দিয়ে পড়াশুনোর চর্চা ছিল। অঙ্ক ভালো পারতাম। এখন সব ভুলে গেছি।

প্রশ্ন : কী কী ধরনের বই আপনি পড়তেন?

উত্তর : হাতের কাছে যা পেতাম। পত্র-পত্রিকা যা আসত তার থেকে পড়তাম। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, চারু বাঁড়ুজ্যে, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের লেখা পড়েছি। রবীন্দ্রনাথের গোরা, নৌকাডুবি পড়েছি।

প্রশ্ন : নরেশ সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র— এঁদের লেখা পড়েছেন?

উত্তর : মনে নেই। সে সময় পত্র-পত্রিকায় পড়ে থাকতে পারি।

প্রশ্ন : আপনি জগদীশ গুপ্তর সব লেখা পড়েছেন?

উত্তর : সবই পড়েছি বলে তো মনে হয়। তবে সব কিছু আজ আর মনে নেই।

প্রশ্ন : নিজের লেখা পাণ্ডুলিপি শেষ করার পর উনি কি আপনাকে পড়ে শোনাতেন বা ঐ সম্পর্কে আপনার সঙ্গে কোনো আলোচনা করতেন?

উত্তর : একেবারেই না। নিজের লেখার ব্যাপারটা সম্পর্কে উনি ছিলেন ভীষণ চাপা। ওঁর কোনো লেখা ছাপা হয়ে বেরনোর আগে কখনো পড়ে দেখি নি। তবে কখনো যে একেবারে দেখি নি তা নয়। *অসাধু সিদ্ধার্থ* উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে আমি বলেছিলাম 'এ তো প্রভাতবাবুর *রত্নদ্বীপের* মতো।' উনি বলেছিলেন 'এ অন্য'।

প্রশ্ন : *অসাধু সিদ্ধার্থ* তো নাটক হিসাবে প্রথমে লেখা হয়েছিল। সেই নাটকটা কি ছাপা হয়েছিল?

উত্তর : না। এই নাটকের পাণ্ডুলিপি কুষ্ঠিয়ার বাড়িতেই ছিল। পরে সেখান থেকেই হারিয়ে যায়।

প্রশ্ন : জগদীশ গুপ্তর লেখা আপনি কেন পড়তেন? নিজের লোকের লেখা বলে না বিশেষ কোনো কারণে?

উত্তর : নিজের লোকের লেখা বলে। পড়ে ভালো লাগত। কেন ভালো লাগত তত বিচার করে পড়ি নি। অত বুঝে পড়ি নি।

প্রশ্ন : আচ্ছা জগদীশ গুপ্ত তো লিখেছেন যে ওঁকে লিখতে বসতে দেখলেই আপনি ওঁকে 'এক পয়সার ধনে' 'এক পয়সার মৌরী' কিনতে পাঠাতেন। বাজার ছিল দূরে, তো আসতে অনেক সময় লাগত। উনি আপত্তি করলে আপনি বলতেন 'বাত সারবে', এ কথা সত্যি?

উত্তর : (ভীষণ জোরে হেসে) সব ফাজলামি কথা, সব কল্পনা। এ-সব বানিয়ে বানিয়ে লিখেছে। মানুষটাই অমনি ছিল।

প্রশ্ন : জগদীশ গুপ্ত— তাঁর লেখা যদি কোথাও প্রশংসা পেত তা হলে কি সেই সম্পর্কে আপনাকে কিছু জানাতেন?

উত্তর : বীরভূমের জজের ফেয়ারওয়েলে একটা মানপত্র লিখে দিতে ওঁর অফিসের সকলে ওঁকে অনুরোধ করেছিলেন। সেই লেখাটা পরে *বীরভূম বার্তা*তে ছাপা হয়। উনি

খুব খুশি হয়ে আমাকে ডেকে দেখিয়েছিলেন। আর একবার *প্রবাসী*তে বাংলা সাহিত্যের ১০০ টা শ্রেষ্ঠ গল্পের একটা তালিকা বেরিয়েছিল। তাতে ওঁর 'মহিষী' গল্পটা ছিল। উনি দারুণ খুশি হয়েছিলেন। মারা যাওয়ার আগে ওঁর চোখে ছানি পড়েছিল। তখন খালি বলতেন 'আমার লেখাগুলো যদি কেউ পড়ে শোনাত।' সংসারের কাজ করে আমি তো সময় পেতাম না। যখন সময় করে শোনাতে চাইতাম তখন হয়তো আর উনি শুনতে চাইতেন না।

প্রশ্ন : জগদীশ গুপ্ত আড্ডা দিতেন?

উত্তর : গান-বাজনার খুব ঝোঁক ছিল। দেশে থাকতে, বোলপুরে থাকতে, পাটনায় থাকতে গান-বাজনার আসরে যেতেন। বন্ধু-বান্ধব, অফিসের সহকর্মীরা আসত। কেউ বলত 'গুপ্ত', কেউ বলত 'গুপ্তদা'। তবে বাড়িতে আড্ডা বসত না খুব একটা।

প্রশ্ন : জগদীশ গুপ্তর কাছে সাহিত্যিকরা কেউ আসতেন?

উত্তর : বোলপুরে থাকতে তারাশঙ্করের ভাই প্রায়ই আসতেন। তারাশঙ্কর এসে তাঁর প্রথম বই *চৈতালী ঘূর্ণী* দিয়ে গিয়েছিলেন। একবার শৈলজানন্দ, প্রবোধ সান্যাল, কালিদাস রায় বোলপুরে গিয়েছিলেন। কলকাতায় এসে উনি প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। দীনেশরঞ্জন, মুরলীবাবুর সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। কলকাতা এলে ওঁদের সঙ্গেও দেখা করতেন, মুরলীধরবাবু শান্তিনিকেতনে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে গেলে উনি গিয়ে দেখা করে আসতেন। গজেন মিত্তিরও মাঝে মাঝে যেতেন। এ ছাড়া বারীণ ঘোষের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ ছিল। আনন্দবাজারের যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ ছিল। সব সাহিত্যিকরা মিলে যে 'রসচক্র' তৈরি করেছিল তার মধ্যে উনি ছিলেন। বারোয়ারি উপন্যাস একটা লেখা হয়েছিল। সেটার *জয়া* নাম ওঁরই দেওয়া। কাশী থেকে যে *উত্তরা* কাগজ বেরত তাঁর সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ ছিল। সুরেশবাবু একবার কুষ্ঠিয়া গিয়েছিলেন। সুরেশবাবুর সঙ্গে মোহিনী মিলের মোহিনীবাবুদের কী রকম সম্পর্ক ছিল। তখন আমার শ্বশুরমশাই মারা গেছেন। উনি (জগদীশ গুপ্ত) বৈঠকখানা ঘরে বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন কুশাসনে বসে, এমন সময় সুরেশবাবু এলেন। অনেকক্ষণ ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা হলো। এ ছাড়া অনেকেই আসতেন, সকলকে চিনতাম না।

প্রশ্ন : আচ্ছা নজরুলের সঙ্গে ওঁর কোনো যোগাযোগ ছিল?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : শরৎচন্দ্রের লেখার প্রতি কি উনি বিরূপ ছিলেন?

উত্তর : না। তবে *শেষের পরিচয়* উপন্যাসটা ঠিক লেখা হয়নি। উনি এরকম মনে করতেন।

প্রশ্ন : জগদীশ গুপ্তর কি কোনো মহিলা বন্ধু ছিল?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : এই-সব সাহিত্যিকদের সঙ্গে কি আপনার কোনো আলাপ ছিল?

উত্তর : না। তখন পর্দা প্রথা ছিল। আমি এঁদের সামনে আসতাম না।

প্রশ্ন : জগদীশ গুপ্ত আর কার বাড়ি যেতেন, মনে পড়ে?

উত্তর : সম্বলপুরে থাকতে বিজয়রত্ন (চন্দ্র) মজুমদারের বাড়িতে উনি যেতেন। বিজয়রত্ন (চন্দ্র) মজুমদারের নাম নিশ্চয় শুনেছ। বিজয়রত্ন (চন্দ্র) মজুমদার ছিলেন আমার শ্বশুরমশাইয়ের সহপাঠী। চন্দনা নদীর ধারে ওঁর শাদা দালান ছিল দেশে। তিনি সম্বলপুরে ওকালতি করতেন। সম্বলপুরে যখন উনি বদলি হন তখন বিজয়রত্ন (চন্দ্র) মজুমদারের সঙ্গে দেখা করতে উনি প্রায়ই যেতেন। তখন বিজয়রত্ন (চন্দ্র) অন্ধ হয়ে গেছেন।

প্রশ্ন : আচ্ছা জগদীশ গুপ্ত কি চাষি, মাঝি, শ্রমিক-জাতীয় মানুষের সঙ্গে মিশতেন বা গল্পগুজব করতেন?

উত্তর : না। সে ধরনের মানুষ ছিলেন না। তবে মেঘচামীতে গেলে আমাদের বাড়ির পেয়াদা আইজদ্দির সঙ্গে খুব গল্প করতেন। গল্পগুজব করার পর আইজদ্দি 'বাবু দুটো টাকা দ্যান' বলে একটা-দুটো টাকা ওঁর কাছ থেকে নিয়ে চলে যেত। সেইজন্যে আইজদ্দি এলে আমরা বলতাম, 'এই, আইজদ্দি এসেছে, এবার গল্প করে টাকা নিয়ে যাবে।'

প্রশ্ন : জগদীশবাবু মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন বলুন?

উত্তর : মানুষ হিসেবে উনি ছিলেন অত্যন্ত চাপা, অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ, আত্মসম্মানবোধ ছিল প্রচণ্ড তীব্র। অত্যন্ত কম কথা বলতেন। তবে হঠাৎ করে এমন একটা কড়া কথা এমন একটা রসিকতা করতেন যেটা আমাদের কাছে কিছুটা আশ্চর্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। সাহিত্য সম্পর্কে প্রচণ্ড দুর্বলতা ছিল। অবসর সময়ের বেশিটাই লিখে কাটাতেন। লেখার কোনো বাঁধাধরা নির্দিষ্ট সময় ছিল না। ওঁর নিজের লেখা সম্পর্কে দুর্বলতা ছিল প্রচণ্ড. কোনো সম্পাদক কখনো যদি ওঁর কোনো লাইন প্লাটানোর ইচ্ছা করতেন, তাতে উনি সহজে রাজি হতেন না। উনি ছিলেন অত্যন্ত নির্লোভ। টাকা পয়সার ব্যাপারে ওঁর প্রবল আগ্রহ কখনো দেখি নি। নিজের লেখাপড়ার জগৎ নিয়ে উনি খুশি ছিলেন। এমনিতে খুব কম কথার মানুষ হলেও আসলে ছিলেন ভীষণ রসিক। আমি কখনো রাগ করলে কানের কাছে বেহালা এনে প্যাঁ প্যাঁ করে বাজাতেন। বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারতুম না, হেসে ফেলতুম। তা ছাড়া মানুষটা ছিলেন একটু খেয়ালি প্রকৃতির।

প্রশ্ন : আপনাদের মধ্যে সম্পর্ক কিরকম ছিল?

উত্তর : উনি ওনার লেখাপড়া, লেখা নিয়ে থাকতেন। আমি আমার ঘর-সংসার নিয়ে থাকতাম। ওঁর সেবা করতাম। সেলাই করতাম। বই পড়তাম। আমরা সুখি ছিলাম। আমার অনেক ভাগ্য ওঁর মতো লোকের স্ত্রী হতে পেরেছিলাম।

প্রশ্ন : আচ্ছা আপনার তো কোনো সন্তান নেই?

উত্তর : না। আমি নিঃসন্তান। তবে আমার খুড়তুতো দেওয়রের মেয়ে সরলা— যাকে আমরা ছবি বলে ডাকি— তাকে মানুষ করেছিলাম। সে বর্তমানে কেশব গুহর স্ত্রী।

প্রশ্ন : আপনার এতক্ষণ বলা থেকে যে জগদীশ গুপ্তকে আমরা পেলাম তার মধ্য থেকে তাঁর লেখার যে জগৎ সেই জগতের মানুষটিকে কি আবিষ্কার করা যায়?

উত্তর : আপনার প্রশ্নটা একটু পরিষ্কার করে বলুন।

প্রশ্ন : আমি বলতে চাইছি যে— জগদীশ গুপ্তর মতো একজন শান্ত, শিল্পী-স্বভাবের মানুষ কী করে চোর, পতিতা, বিকৃত মানসিকতা-সম্পন্ন চরিত্রদের তাঁর সাহিত্যে আনলেন? এর পেছনে কোনো বাস্তব পটভূমিকা আছে কি?

উত্তর : সরাসরি কাদের দেখে বা কী ভাবে উনি চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছেন সে কথা বলা মুস্কিল। তবে আমার মনে হয় আদালতের মামলার নথিপত্র নিয়ে কাজ করার সময় তিনি এই-সব পাপী লোকদের খোঁজ পেয়ে থাকবেন। এ ছাড়া একটা বিষয় আমি আমার শাশুড়ির মুখে শুনেছিলাম। আমার শ্বশুরবাড়ির খুব কাছেই, মানে বাড়ির জানলা দিয়ে দেখা যেত— একটা ছোটো পতিতা পল্লী ছিল। পরে আগুন লেগে ওদের ঘরগুলো পুড়ে যায়। তারাও কোথায় চলে যায়। খুব ছোটো বয়সে অন্তত ওর ৩।৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত এই পতিতাদের কেউ কেউ ওঁকে খুব আদর-যত্ন করে সারাদিন কাছে রেখে দিত। একবার ঐ ছোটোবেলায় উনি ড্রেনের মধ্যে পড়ে যান। ওরাই ওঁকে ড্রেন থেকে তুলে বাঁচায়। ছোটো বয়সের দেখা এই পতিতারা ওঁর শিশুমনে হয়তো কোনো ছাপ ফেলেছিল যা পরে ওঁর সাহিত্যিক জীবনে কাজ করেছে।

এছাড়া ওঁর আরও একটা অভ্যাস দেখেছি। যেটা আমার নিজেরও একটু অদ্ভুত ঠেকত। তখন তো পর্দা প্রথা ছিল। কখনো হয়তো একগলা ঘোমটা দিয়ে ওঁর সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছি। দুজন নিম্নশ্রেণির পুরুষ বা মেয়েমানুষ রাস্তায় ঝগড়া করছে, উনি দাঁড়িয়ে পড়ে যতক্ষণ সম্ভব ঐ ঝগড়া শুনতেন। আমাকেও রাস্তায় ঐভাবে ঘোমটা মাথায় কলাবউ-এর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। একদিন রান্নাঘর থেকে আমাকে ডেকে তাড়াতাড়ি জানলার ধারে টেনে নিয়ে এসে বললেন, 'ঐ দ্যাখো', চেয়ে দেখি একজন নিম্নশ্রেণির পুরুষ আর মেয়ে দুজনে দুটো বাখারি নিয়ে মারামারি করছে।

প্রশ্ন : এখন আপনার সময় কাটে কী ভাবে?

উত্তর : নিজের রান্না-খাওয়ার জোগাড় করে। ঠাকুরপুজো করে, আর ওঁর কথা মনে করে।

প্রশ্ন : আপনার কোনো বিশেষ ইচ্ছে আছে কি?

উত্তর : না। আমার আর কোনো ইচ্ছে নেই। আমি ওপারে যাবার দিন গুনছি।